অন্ধকারের সারাৎসারে

মেঘ মুখোপাধ্যায়

অন্য অন্ধকার আছে? তা-ও চেনা, থেকেছি নিবিড়
ঘন নীল অন্ধকারে, স্পন্দমান ছন্দে অতল স্মৃতির হর্ষে ভয়ে
কাব্যের আদিম গর্ভে যেখানে করেছে মহা ভিড়
লক্ষ-লক্ষ জীবন-মৃত্যুর ক্ষিপ্র দিব্য অন্ধকার।
—বিষ্ণু দে (সেই অন্ধকার চাই)

সকল মাটির গন্ধ আর সব নক্ষত্রের আলো
যে পেয়েছে, —সকল মানুষ আর দেবতার কথা
যে জনেছে, —আর এক ক্ষুধা তবু —এক বিহ্বলতা
তাহারও জানিতে হয়। এই মত অন্ধকারে এসে!
—জীবনানন্দ (জীবন-১৭)

এই যে প্রবন্ধটি লিখতে বসেছি এখন, সেটিকে বলা যেতে পারে বড় এক প্রবন্ধের অথবা কয়েকটি প্রবন্ধের সত্যাভিলাষী অন্বেষণ বা সাহিত্যপ্রকল্পের পূর্বাভাষ। আসলে এ বিষয়ে শিল্প - সাহিত্য - বিজ্ঞান - দর্শনের প্রাচীন থেকে নবীন নানা চিন্তার থেকে সূত্র আহরণ করে আমরা গড়ে তুলতে চাইছি সাহিত্যের একটি হর্ম্য - এক স্থাপত্য- একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ। দু'দশক ধরে বিষয়টি নিয়ে আমি ভাবছি, আমার হৃদয়ে মস্তিস্কে তথা বোধে নানাভাবে, নানা দিক দিয়ে হানা দিয়ে গেছে, আলোড়ন জাগিয়েছে বিষয়টি। কখন যেন একটা চিন্তার বীজ এসে পড়েছিল আনমনে, তারপর তা মাটির গহনে শিকড় আর আকাশে হাওয়ায় ডালপালা ছড়িয়ে যেন মহীরূহের আকার নিয়ে চলেছে। আমার সঙ্গে অন্ধকারের এ যাত্রায় যোগ দিতে পারেন পাঠক। তাঁর নিজের স্মৃতির ভাঁড়ার থেকে তুলে আনতে পারেন অনেক মণিমুক্তো, প্রচুর নজির; তথ্য - সূত্র - দৃষ্টান্ত- উপমা- সঙ্গ- প্রসঙ্গ যোগ করে এগিয়ে যেতে পারেন এ - পথে, অন্ধকারের সারাৎসারে পৌঁছনোর লক্ষ্যে। বীজ পড়েছিল কখন? দু'দশক নাকি প্রায় তিন দশক আগেই হবে।

যৌবনের উন্মেষে জীবনানন্দের কবিতা পড়ে কি? কৈশোরের শেষে বা প্রথম যৌবনে 'বনলতা সেন' -এর এইসব উচ্চারণে হয়ত নিহিত ছিল সে বীজ :

'সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মলয়
সাগরে/ অনেক ঘুরেছি আমি'; 'আরো দূর
অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে;', 'চুল তার কবেকার
অন্ধকার বিদিশার নিশা,', 'তেমনি দেখেছি তারে
অন্ধকারে;' অথবা 'থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি
বসিবার বনলতা সেন'।

যেন অন্ধকারের উতরোল থেকে উঠে এসেছিল কবিতাটি; অন্ধকার দিয়ে মোড়া এক নারী, অন্ধকার দিয়ে নির্মিত এক শিল্প, তাই স্তবকে স্তবকে কয়েক পঙ্‌ক্তি পরেই ফিরে আসছে 'অন্ধকার' শব্দটি, উচ্চাঙ্গ সংগীতে মোটিফের মতো। আর মনে পড়ে যায় এই কবিরই শিহরণ ধরানো আশ্চর্য ছন্দোবন্ধ: গভীর অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর ছল ছল শব্দে জেগে উঠলাম আবার। কবিতাটির নাম 'অন্ধকার'—এটি প্রথম পদ।

নাকি সে বীজ জমিতে পড়েছিল বুদ্ধদেব বসুর কাব্যগ্রন্থের এই নাম থেকে: যে আঁধার আলোর অধিক। কী অদ্ভুত এই শব্দবন্ধ। আর কী তীব্র এর অভিঘাত। কেমন যেন কেঁপে যাই আমরা, মনে মনে গুনগুন করে ফেরে কবিতা বইয়ের নামটি; যে আঁধার আলোর অধিক। আলোর অধিক এক আঁধারের কথা বলেছেন কবি! আলোর চেয়ে বেশি ব্যঞ্জনাময় সে আঁধার? বেশি শক্তি তার? আলোর চেয়ে আকর্ষণীয় তার রূপ? বেশি তার দ্যুতি? অতিরিক্ত প্রভাব? আলোর চেয়ে বেশি কী প্রার্থনীয় থাকতে পারে মানুষের? এক সংবেদনশীল কবির? রবীন্দ্রনাথ এত আলো চেয়েছেন। আলোর পূজারী তিনি। আলোর চেয়ে বেশি কিছু আছে নাকি তেমন এই পৃথিবীতে? এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে? আলোর চেয়ে বেশি কাম্য? মৃত্যুপূর্বে গ্যেটের শেষ উচ্চারণ ছিল, আলো, আলো। এইসব ভাবনার ঘাড়ে এসে পড়ল আরেক অভিঘাত। বুদ্ধদেবেরই সতীর্থ, আমাদের অন্যতম প্রধান কবি বিষ্ণু দে তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থের নাম দিয়েছেন : সেই অন্ধকার চাই। বিষ্ণু দে - বুদ্ধদেব বসু মিলিয়ে কথাটা কি তাহলে এমন দাঁড়িয়ে গেল না যে : সেই অন্ধকার চাই যে - আঁধার আলোর অধিক।

তাহলে বিষ্ণু দেও চাইছেন সেই অন্ধকার। অন্ধকারের আগে তিনি বসিয়ে দিচ্ছেন 'সেই' শব্দ। 'সেই' শব্দটি আগে জুড়ে দিয়ে 'অন্ধকার' বিষয়ে কত কী বলা হল, আর কত কিছু রইল অব্যক্ত। 'সেই' শব্দটা এক ইঙ্গিত। এক অজানা ইশারা। কথাটা শুনেই আমাদের জানতে ইচ্ছে করে, কেমন 'সেই' অন্ধকার যা কবির অভিপ্রেত? কোন 'সেই' অন্ধকার চান তিনি? অন্য অন্ধকার নয়, যে কোনও নয়, তাঁর চাই কেবল 'সেই' অন্ধকার। তাঁদের এই নামের কবিতাদু'টি পড়ে দারুণ আলোড়িত হয়েছিলাম। ঘোর লেগে গিয়েছিল। মনে ঘুরে ঘুরে আসত।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতা বা সহজ অভিধায় বাংলা আধুনিক কবিতার তিন প্রধান—জীবনান্দ, বুদ্ধদেব বসু বা বিষ্ণু দের কবিতা বা কাব্যগ্রন্থের নামগুলিই কি আমাকে প্রথম সচেতন করে তুলেছিল, একটা প্রশ্ন জাগিয়ে দিয়েছিল অন্ধকারের সঙ্গে কবিমনের সম্পর্ক নিয়ে? রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতা থেকেই কি প্রথম বীজ বপন হয়েছিল আমার মনে?

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ থেকে নয়? রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে নয়?

আমার মনে প্রশ্ন তুলেছে অন্ধকার। কবি, আর সংস্কৃতের অনুসরণের অর্থব্যঞ্জনা বাড়িয়ে নিয়ে আমরা যদি অন্য গোত্রের শিল্পীদের অন্তর্ভুক্ত করি কবি অভিধায়, তাহলে লোকে যেমন সচরাচর সহজ করে উচ্চারণ করে 'কবিশিল্পী' —সেই কবি শিল্পীদের সঙ্গে আলোর চেয়ে কি অন্ধকারের ঘনিষ্ঠতা বেশি? 'অন্ধকারের সঙ্গেই কি কবিমনের সম্পৃক্তি বেশি? 'অন্ধকারের সঙ্গে' কথাটারও অনেক ব্যাখ্যা দরকার। হয়ত সে কারণেই এই লেখা, সেজন্যই এ সন্দর্ভের চেষ্টা। রবীন্দ্রনাথ মানেই তো আলো। রবীন্দ্রনাথ মানেই সূর্য -তারা-উজ্জ্বল-প্রোজ্জ্বল-ভাস্বর। সেখানে অন্ধকারের চিন্তা বপনের প্রশ্ন আসে কোথা থেকে? আমার আসল মনে অন্ধকারকে উসকে দেওয়ার ভূমিকা রবীন্দ্রনাথ নেবেন কী করে?

আমাদের মনে পড়ে যায়, ১৯৬৪ - তে 'রাজা' অভিনয়ের সময় বহুরূপী একটি ঘোষণা করেছিল একটি অন্ধকারের নাটক বলে। সে বছর অভিনীত বহুরূপীর দু'টি অন্ধকারের নাটকের অন্যটি ছিল সোফোক্লেসের অয়দিপাউস। অয়দিপাউসকেইবা কেন শম্ভু মিত্র বা বহুরূপীর মনে হয়েছিল অন্ধকারের নাটক? এও এমন প্রশ্ন।

রাজা নাটকের শুরুতেই আমি কেমন চমকে গিয়েছিলাম! এই সেই শুরুর দৃশ্য :

(১)

অন্ধকার ঘর

রাণী সুদর্শনা ও তাঁহার দাসী সুরঙ্গমা

সুদর্শনা। আলো, আলো কই। এ ঘরে কি একদিনও আলো জ্বলবে না।

সুরঙ্গমা। রাণীমা, তোমার ঘরে-ঘরেই তো আলো জ্বলছে— তার থেকে সরে আসবার জন্যে কি একটা ঘরেও অন্ধকার রাখবে না।

সুদর্শনা। কোথাও অন্ধকার কেন থাকবে।

সুরঙ্গমা। তাহলে যে আলোও চিনবে না, অন্ধকারও চিনবে না।

সুদর্শনা। তুই যেমন এই অন্ধকার ঘরের দাসী তেমনি তোর অন্ধকারের মতো কথা, অর্থই বোঝা যায় না। বল্ তো এ ঘরটা আছে কোথায়। কোথা দিয়ে এখানে আসি, কোথা দিয়ে বেরোই, প্রতিদিনই ধাঁদা লাগে।

সুরঙ্গমা। এ ঘর মাটির আবরণ ভেদ করে পৃথিবীর বুকের মাঝখানে তৈরি। তোমার জন্যেই রাজা বিশেষ করে করেছেন!

সুর্শনশা। তাঁর ঘরের অভাব কী ছিল যে এই অন্ধকার ঘরটা বিশেষ করে করেছেন!

সুরঙ্গমা। আলোর ঘরে সকলেরই আনাগোনা—এই অন্ধকারে কেবল একলা তোমার সঙ্গে মিলন।'

অন্ধকার দিয়ে রঞ্জিত এই নাট্যসূচনা কেমন যেন বিহ্বল করে দেয় আমাদের। যেন কিছুই বুঝে উঠতে পারি না! এই সংলাপগুলো আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয় এক রহস্যের দ্বারদেশে; অস্পষ্টতার, অজানার সামনে কিন্তু বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারি এক তীব্র আলো - অন্ধকারের নাটক শুরু হচ্ছে। রহস্যময় অন্ধকার এক জগতে আমরা ঢুকে পড়তে যাচ্ছি। সংলাপে বার বার ফিরে আসছে 'অন্ধকার'। অন্ধকারএক ধরে দুই নারী গভীর স্বরে কথা বলছেন আলো - অন্ধকার নিয়ে। রহস্যময় তাঁদের কথার ধরন। ব্যক্ত করার চেয়ে ইঙ্গিত করার দিকে ঝোঁক। কথা বলার চালে দৈনন্দিনের একটা ভাব থাকলেও, কথার ভেতরটা যেন ঠিক রোজকার নয়; বাস্তবের হয়েও কথাগুলো যেন ঠিক বাস্তব নয়। চিনেও যেন চিনতে পারি না, ছুঁয়েও যেন ছুঁতে পারি না, কাছের মনে হলেও কেমন যেন দূরের কিংবা দূরের লাগলেও যেন বড় বেশি কাছের। আলোর থেকে অন্ধকার আর অন্ধকার থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে রানি সুদর্শনা আর দাসি সুরঙ্গমার গলা থেকে।

আমাদের মনে ঘুরঘুর করতে থাকে এই সংলাপগুলো:

'তোমার ঘরে ঘরেই তো আলো জ্বলছে— তার থেকে সরে আসবার জন্যে কি একটা ঘরেও অন্ধকার রাখবে না।'

'তোর অন্ধকারের মতো কথা, অর্থই বোঝাই যায় না।'

'আলোর ঘরে সকলেরই আনাগোনা—এই অন্ধকারে কেবল একলা তোমার সঙ্গে মিলন।'

নাট্যসূচনার এই সংলাপগুলোর অভিঘাতে আমাদের মনে ঝড় উঠতে থাকে, রবীন্দ্রনাথ আমাদের হাতে তুলে দেন কত সূত্র, জন্মাতে থাকে এরকম কত ভাবনা—

কেনই বা 'রাজা'র ইংরাজি তর্জমার নাম 'King of the Dark Chamber'? ঘরে ঘরে আলো জ্বললেও তার থেকে সরে আসবার জন্য আমাদের একটা অন্ধকার ঘর চাই। আলো থেকে সরে আসা চাই অন্ধকারে, অন্ধকার ঘরে।

আলোর ঘরে সবাইকার প্রবেশ অবাধ। সকলেরই আনাগোনার বাইরে চাই একটা আড়াল; নিভৃতি, নির্জনতা— যাই বলি না কেন— যেখানে কেবল দেখা হবে দু'জনের। মুখোমুখি দাঁড়াবে দু'জনে সেই অন্ধকারে। কোন দু'জন?

শঙ্খ ঘোষ এই সূত্রে যেমন করে ভেবেছিলেন, তা আমরা জেনে নিতে পারি এখানে : 'এখন কোথাও একটা সুনিশ্চিত অন্ধকার ঘর নেই আমাদের —সব কিছুর অন্তরালে— সেখানে আপন মনে সর্বময়তার উপলব্ধি মেনে নেওয়া যায়, যেখানে বিশ্বের সঙ্গে আত্মযোগের কোনো নিবিড় সূত্র রচনা করে তোলা সম্ভব।'

'রাজা : রহস্য ও প্রকাশ্য, কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক)

এ-নাটকের পরিধি পেরিয়ে আমরা বলতে পারি, কবি আর কবির আত্মর, শিল্পী আর তাঁর সত্তা, শিল্পী আর তাঁর আত্মজিজ্ঞাসা, কবির সঙ্গে কবির অভ্যন্তরীণ শক্তির সামর্থ্যের, কল্পনার, স্বপ্নের দেখা হয় সেখানে। শিল্পীর সঙ্গে তাঁর চৈতন্যের সাক্ষাৎ ঘটে যেখানে সে তো অন্ধকারে। কবিমনের সেই অন্ধকার ঘরেই জন্ম নেয় কবিতা। শিল্পীসত্তার সেই অন্ধকারেই জন্মায়

ও পুষ্ট হয় চিত্রকলা - সংগীত - নাট্য - নৃত্য- স্থাপত্য ভাস্কর্য বা চলচ্চিত্র। আমরা তার রূপ দেখি, প্রকাশ দেখি আলোয়, হয়ত বা সম্পূর্ণ আলোয় নয়, আলো-অন্ধকারে, ছায়াময় এক পরিবেশে। নাট্যকলা আর চলচ্চিত্র।

অন্ধকারের সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধ হল রাতের। রাত আর অন্ধকার যেন অবিচ্ছিন্ন। মনে এসে যায় 'সাতটি তারার তিমির'। উভয়ে উভয়কে জড়িয়ে যেন এক সত্তা। গত শতকের সত্তর দশকের শেষ দিকে (১লা বৈশাখ ১৩৮৫) যখন বেরোল অরুণ মিত্রের 'শুধু রাতের শব্দ নয়' —আশির প্রথম দিকে একটি কবিতা বইয়ের সে নাম শুনে আর নাম কবিতাটি প্রথমে কবিকণ্ঠে শুনে আর পরবর্তীকালে পড়ে আমার চিন্তা উসকে উঠেছিল। তার প্রায় দু'দশক পরে জানুয়ারি ১৯৯৬ -তে প্রকাশ পেয়েছিল অরুণ মিত্রের আর একটি কাব্যগ্রন্থ, যার নামেও জড়িয়ে সেই অন্ধকার— 'অন্ধকার যতক্ষণ জেগে থাকে'। এর মাত্র তিন বছর পরে, জানুয়ারি ১৯৯৯ - তে প্রকাশ পেল শঙ্খ ঘোষের কাব্যগ্রন্থ 'ছন্দের ভিতরে এত অন্ধকার' —আর আমি চমকে উঠলাম। আবার অন্ধকার। কবি আর নাম পেলেন না! মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে আমাদের ভাষার দুই প্রধান কবি তাঁদের কবিতার বইয়ের নাম রাখছেন অন্ধকার দিয়ে, অন্ধকার শব্দযোগে, অন্ধকারের ব্যঞ্জনা মাখিয়ে।

কেন এমন হয়? অন্ধকার তবে কী এমন শক্তি? কী এমন শক্তি এই অন্ধকারের? কবিতার থেকেই এল প্রথম স্ফুলিঙ্গ। আমি ভাবতে শুরু করলাম; অন্ধকারমাখা, অন্ধকারজড়িত, অন্ধকারের তেজে দীপ্যমান নানা কবিতা আর কবিতার স্তবক, পঙ্‌ক্তি ভিড় করে আসতে লাগল আমার মাথায়। আমাকে বিহ্বল, অভিভূত করে ফেলতে লাগল সেইসব কবিতার দীপ্তি, অন্ধকারের প্রয়োগে স্পন্দমান কত রচনা, অন্ধকারকে কতভাবে দেখতে চাইছেন কবি। কবিতা দিয়ে শুরু হলেও আমার অন্বেষণ চলল শিল্পের অন্য প্রান্তরে, নানা আঙ্গিকগুলিতে কীভাবে দেখা দিচ্ছে সে, কেমন অপরিহার্য তার ভূমিকা। চিত্রকার, নাট্য আর চলচ্চিত্র পরিচালকেরা তো আলো - অন্ধকারের দ্বন্দ্ব বাদ দিয়ে তাঁতের শিল্পরচনা করতে একরকম অপারগ। আর তাঁদের যাঁরা সহযোগিতা করে একটি মিশ্র শিল্পকে সম্পূর্ণ করে তোলেন, পাঁচ দশক আগে যাঁদের মনে করা হত কেবল উন্নতমানের কারিগরি, শিল্পী বলতে দ্বিধা ছিল, নাট্যমঞ্চের সেই আলোকশিল্পীর আর চলচ্চিত্রের ক্যামেরাম্যান তথা আলোকশিল্পীদের কথা আমরা বাদ দিই কি করে।

মঞ্চে তথা নাটকের কোনও দৃশ্য আলো করা বিষয়ে তাপস সেনের একটি কথা পড়ে আমার মাথায় গেঁথে গিয়েছিল। অন্ধকার বা আলো - অন্ধকার - ছায়া নিয়ে আমার ভাবনাকে বহু দূর প্রসারিত করে দিয়েছিল এই অসামান্য আলোকশিল্পীর ওই মন্তব্যটি। পরে এই কথাটির সূত্র ধরে আমি তাঁর মুখ থেকে এ প্রসঙ্গে শুনে নিয়েছিলাম তাঁর আরও চিন্তাভাবনার কথা। উনি বলেছিলেন এরকম যে মঞ্চে আলো করা, যাকে মুদ্রিত ভাষায় বলা হয় আলোকসম্পাত, হল আসলে মঞ্চকে অন্ধকার করা। আলো করা নয়, কাজটা অন্ধকার করার। আলো দেওয়া বলা হয় বটে, আসলে নাটকের, নাট্যকারের, পরিচালকের কল্পনাকে অনুসরণ করে দৃশ্যটির, বা নাট্য মুহূর্তটিকে দর্শকের কাছে বাস্তব করে তুলতে, ব্যঞ্জনাময় করে তুলতে মঞ্চের অধিকাংশ জায়গাকে অন্ধকারে ঢেকে দিতে পারা, যাতে নির্দিষ্ট কিছু অংশ বা জায়গামাত্র নিখুঁতভাবে আলোকিত হয়ে থাকতে পারে— এটাই তো আলোকশিল্পীর মুনশিয়ানা। বেশিরভাগটা অন্ধকারে মুড়ে দিয়ে অবশিষ্ট একটু বা খানিকটা অংশের ওপর আলো বজায় রাখা—নানা তীক্ষ্ণতা আর তীব্রতার— আর সেটাকে কমানো বা বাড়ানো, আস্তে আস্তে মুছে ফেলা, বাকি অন্ধকারের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া বা বাকি অন্ধকারটাকে মুছে ফেলে আলোকিত করে তোলা সমগ্র মঞ্চকে —এই তো কাজ!

কোনও সন্ধ্যার রঙ্গমঞ্চে পরিচালক তাঁর অভিনেতা- অভিনেত্রীদের নিয়ে, দৃশ্যসজ্জা নির্মাণ করে অভিনয়কলা অবলম্বনে দর্শকদের কাছে যা উদ্ভাসিত করতে চান, নাট্যকার বা তাঁর নিজের যে বার্তা সংকেত অনুভব প্রশ্ন পৌঁছে দিতে চান রসান্বিত করে, রচনা করতে চান মঞ্চের শিল্প, তাঁর জন্য তাঁর প্রয়োজন নিখুঁত নির্দিষ্ট মাত্রার ও বৃত্তের আলো। আলোকশিল্পীর দায়িত্ব এই আলোকটুকু বের করে আনা, আলোটাকে জাগিয়ে তোলার জন্য মঞ্চকে অন্ধকার করে তোলার কৌশল। আলো জ্বেলে অন্ধকার দূর করার যে কথা শুনতে আমরা আবাল্য অভ্যস্ত, মঞ্চে বা উন্নতমানের চলচ্চিত্রে ঘটা চাই তার বিপরীত। অন্ধকার দিয়ে ঘিরে রাখা আলোকে। অন্ধকার দিয়ে আলোকে রচনা করতে হয় সেখানে। আলোকে ছড়িয়ে ভাসিয়ে দিলে হবে না, আলোকে আগলে রাখতে হবে, সংহত করে রাখতে হবে অভীষ্ট স্থানে, অপরিহার্য অঞ্চলে কোনও বস্তু, নির্মাণ কিংবা অভিনেতা অভিনেত্রীর শরীরে, মুখে বা মুহূর্তবিশেষে দ্যোতনাময় অঙ্গে। তবেই সৃষ্টি করা যাবে শিল্প। নাটক দেখতে অভ্যস্ত দর্শকদের স্মৃতিতে এরকম অনেক সার্থক দৃশ্যের ঝলকানি খেলে যাচ্ছে নিশ্চয়। বহুরূপী আর এল টি জি বা পি এল টি-র বহু নাটকের অবিস্মরণীয়তা যে তাপস সেনের অসামান্য আলোর শিল্পের একটা বড় ভূমিকা ছিল তা কে না জানে! এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় অন্ধকার দিয়ে গড়া, মুড়ে রাখা, একটি অন্ধকারের চলচ্চিত্রের নাম; মৃণাল সেনের খণ্ডহর। তাপস সেনের রচনা করা অন্ধকার - ছায়া - ছায়াচ্ছন্নতা - আলোর ইশারা। ভারাক্রান্তকরা প্রগাঢ় বিষাদের এই চলচ্চিত্র আসলে আলো দেখা দিয়ে মিলিয়ে যাওয়ার কবিতা। পর্দায় অন্ধকার রচনা করার নৈপুণ্য ভিন্ন রূঢ় কবিতা সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল না। এই অন্ধকার ছিল পরিচালকের মাথায়, তিনি তা সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন আলোকশিল্পী তাপস সেন আর ক্যামেরাম্যানের বোধে। তবেই সম্ভব হয়েছিল এই চিত্ররূপ। পরিমিত আলো - অন্ধকারের প্রয়োগ ভিন্ন চলচ্চিত্রশিল্পকে ভাবাই যায় না। স্বল্প পরিমিত আলো আর অধিক অন্ধকার দিয়ে রচিত বিশ্বচলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলি—তা কি আমরা জানি না?

(২)

অন্ধকারের আর রেখো না ভয়
আমার হাতে ঢাকো তোমার মুখ
—বিষ্ণু দে

অন্ধকারের প্রতি কবি-শিল্পীদের তীব্র টান। গভীর সেই আকর্ষণ। অন্ধকার যেন এক পরম প্রিয় অথবা প্রিয়া। দুর্যোগময়ী

নিশীথিনীর শত বাধা বিপত্তি অস্বীকার করে বিরহিনী রাধার মতো কবিমন ছুটে যায় অন্ধকারের অভিসারে, প্রিয়তমকে পাবে বলে, মিলন হবে বলে। এই চিরপরিচিত উপমাটির আশ্রয় না নিয়ে উপায় রইল না।

অন্ধকার নিয়ে উচ্ছ্বসিত, অথচ আলোর কথা বলছি না, তা কি হয়?

আলোর প্রসঙ্গ না এনে অন্ধকারের সত্বাকে ছোঁয়া যাবে না। সাধারণভাবে মনে হয়, আলোর মধ্যে নিশে আছে এক পূর্ণতার বোধ। আলো মনে অস্তি। আছি বা আছে। থাকা। তবে কি অন্ধকার অপূর্ণতার সমার্থক? আলো অভাব মানেই নাস্তি। কবিমনের অন্থকারপ্রবণতা, অন্ধকার কামনার অর্থ কি শূন্যতাবোধ। নেতি : না - থাকা। অনস্তিত্বের বোধ? এটিই প্রচলিত স্বতঃসিদ্ধ ধারণা কিন্তু কবিদের কাছে দাঁড়াতে পারে না। অন্ধকার বললেই যে আলোকহীনতা বা নেতি বা অভাবের কথা বোঝায় যেমন আমরা বলি, 'ইতিহাসের অন্ধকারময় যুগ' বা 'মধ্যযুগের অন্ধকার' ইত্যাদি, কবিরা যে অন্ধকারকে সেই প্রচলিত অর্থে প্রয়োগ করেন না তা নয়, করেন বই কি। অন্ধকার মানে ভয়। ভয়ানক। আশংকা, ত্রাস, অমঙ্গল ও অনিশ্চয়তার বোধ মিশে আছে এর সঙ্গে। অন্ধকার মানে যেন থেমে যাওয়া, এক অবরুদ্ধ শীতল ব্যাপার। হতাশা আর নৈরাশ্যকে আমরা অন্ধকারের সঙ্গে চিহ্নিত করে থাকি।

প্রাচীন ঋণিদের (কবির্মনীষী) থেকে আজ পর্যন্ত দেশে দেশে কবিরা এই অন্ধকারের বিরুদ্ধ কবিতা লিখে আসছেন। ভয়ানক এই অন্ধকারকে অতিক্রম করতে, জয় করতে বলেছে মানুষকে। এই অন্ধকারের শক্তির কাছে অবসন্ন, পরাভূত হতে নিষেধ করছেন দুর্বল, ত্রস্ত মানুষকে। এই অন্ধকারদানবকে পরাস্ত করে আলো নিয়ে আসেন কবি শিল্পীরা। আবাহন করে আলোকে।

কন্তু আমরা বলছি অন্য অন্ধকারের কথা, যে - অন্ধকারে কবিমন ম্রিয়মান, অবসন্ন, ত্রস্ত তো হয়ই না বরং সমস্ত ক্লান্তি শেষে হয়ে ওঠে উজ্জীবিত, উদভাসিত। যে - অন্ধকারে মগ্ন হবার অবকাশ খোঁজে কবি, শিল্পী; যে - অন্ধকারে তাকে দেবে স্নিগ্ধতা, প্রসন্নতা; তার উদ্ভ্রান্ত উত্তেজিত চিত্তে আরাম আনবে, ভরে দেবে প্রশান্তি আর পূর্ণতায়। এই অন্ধকার চাওয়ার অর্থ চেতনার গভীর গহনে যাত্রা। চেতনার অতল প্রদেশে ডুব দিয়ে জীবনের তাৎপর্য খোঁজা। এক প্রগাঢ় অন্বেষণের প্রয়োজনে কবি খোঁজেন এই অন্ধকারের সান্নিধ্য। এই অন্ধকারে একাকী হওয়ার অর্থ বিরাট বিশ্বের সামনে দাঁড়ানো। কবির কাছে এই অন্ধকার এক অনাবিষ্কৃত দেশ, এক রহস্যে মোড়া প্রান্তর।

আধুনিক মনের আর্তি আর দ্বন্দ্বকে ধরতে চান কবি। আধুনিক জীবনের জটিলতাকে বুঝতে চান। জীবনের জটগুলিকে চান ছড়াতে। তাই তাঁর চাই অন্ধকার। সত্তার সমগ্রতাকে অনুভব করার জন্য, ছুঁয়েছেন নাড়ি টিপে টিপে দেখার জন্য। নিজেকে আর জগৎকে দেখা, বিক্ষুব্ধ—আলোড়িত সংসারকে নিবিষ্টরূপে জানার জন্যই কি অন্ধকার তাঁর কাছে এত অভিপ্রেত? রেমব্রান্ট প্রগাঢ় অন্ধকারের মধ্যে থেকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন নিজের মুখ, দেখতে চেয়েছিলেন নিজকে, আত্মপ্রতিকৃতির পর আত্মপ্রতিকৃতিতে চলেছিল তাঁর এই আত্মানুসন্ধান। গভীর অন্ধকারের ভিতর থেকে নিজের মুখকে উদ্ভাসিত করে আঁকার এক আঙ্গিক খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি। চারপাশটা অন্ধকার করে না দিয়ে যেন নিজেকে চেনা মুশকিল হয়ে ওঠে। পারিপার্শ্বের কোলাহল, বিশৃঙ্খলা আর উত্তেজনা থেকে নিজেকে আড়াল করে নেবার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল এই গাঢ় অন্ধকার। শিল্প তো একটা চেষ্টা। বিশ্বের সঙ্গে নিজের সম্পর্কটাকে জানার আর যাচিয়ে দেখার, পরখ করে নেওয়ার একটা প্রয়াস। এই সুকঠিন যাত্রাপথে আলোর চেয়ে অন্ধকারই হল শিল্পীর সম্বল। আলো বড় বেশি বাচাল, বড় বেশি বলে, বলতে চায় বস্তুকে মূর্ত করে তোলে আলো, এদিকে শিল্পের তাগিদ অমূর্তের দিকে, বিমূর্তের দিকে।

সত্যকে জানার পথে আলো কি আবরণ? বাধাস্বরূপ? দাঁড়িয়ে থাকে মানুষ আর সত্যের মাঝখানে দেওয়াল হয়ে? সত্যকে আলোয় নিয়ে আসার প্রক্রিয়া চলে অন্ধকারে, অন্তরালে, অপ্রকাশ্যে। আলো খুব প্রকাশ্য, প্রত্যক্ষ। শিল্পী তাই মুখ ঘুরিয়ে নিতে চান অন্ধকারের দিকে। অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে বহু সত্র, নানা দ্যোতনা, বিচিত্র তরঙ্গ— আলোয় যা দুর্লভ। অন্ধকারের ভাষা বুঝতে তাই কবি-শিল্পীরা এত অধীর, এমন উৎসুক। আমরা তাঁদের আকর্ষণের, প্রেরণার, উৎসাহের আর উদ্দীপনার ভাঁজগুলি খুলে খুলে দেখতে চাই। অন্ধকারের প্রতি তাঁদের আকুতির স্বরূপ বুঝতে চাই।